Hazrat Salman Farsi[ra]

By
Farid Ahmad Naveed

Translated in to Bengali
By
Murtaza Ali

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

ফরিদ আহমদ নবীদ

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

ফরিদ আহমদ নবীদ

ভাষান্তর ঃ- মোরতোজা আলী

Hazrat Salman Farsi (ra)

Farid Ahmad Naveed

Translated by: Murtaza Ali

নাজারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, ভারত

পুস্তক :	হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)
মূল :	ফরিদ আহমদ নবীদ
ভাষান্তর ঃ-	মোরতোজা আলী
প্রকাশকাল ঃ	এপ্রিল, ২০১৬
সংখ্যা ঃ-	১০০০ কপি
প্রকাশক ঃ	নাজারাত নশর ও এশায়াত, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কাদিয়ান, গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত
মুদ্রণে ঃ	ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, ভারত

Title :	'Hazrat Salman Farsi (ra)
By :	Farid Ahmad Naveed
Translated by :	Murtaza Ali
Published in India :	April, 2016
Copies :	1000
Published by :	Nazarat Nashr -O- Ishaat Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India
Printed at :	Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab, India

ভুমিকা

আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবীগণের মধ্যে একজন অন্যতম সাহাবী ছিলেন হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) যার কাঁধে হাত রেখে তিনি (সাঃ) শেষ যুগে ইমাম মাহদী (আঃ) -এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি করেছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন যে, শেষ যুগে ঈমান সপ্তর্ষিমন্ডলে চলে গেলে এই বংশের এক বা একাধিক ব্যক্তি সেই ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন এবং ধর্মের খাতিরে নিজ গৃহ, আত্মীয়-স্বজন ও মাতৃভুমি ত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। "হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)" মূল পুস্তিকাটি জনাব ফরিদ আহমদ নবীদ সাহেব উর্দূ ভাষায় রচনা করেন।

এই পুস্তিকাটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন জনাব মোরতোজা আলী সাহেব, আহমদীয়া মুসলিম জামাত বড়িশা। পুস্তিকাটি প্রথমবার বাংলা ভাষায় ভারত থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। আশা করি পুস্তিকাটি বাংলা ভাষাভাষী আহমদীদের এই সাহাবীর জীবনী সম্পর্কে জানতে সহায়ক হবে। পুস্তিকাটি প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন আল্লাহ তা'লা তাদের সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভুষিত করুন। আমীন॥

ওয়াসসালাম
খাকসার
হাফেজ মাখদুম শরীফ
নাযের, নশর ও এশায়াত কাদিয়ান।

এপ্রিল, ২০১৬

মুখবন্ধ

আঁ হযরত (সাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানপ্রাপ্ত সাধু-সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে তাঁর (সাঃ) জন্য প্রচণ্ডভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। এদের মধ্যে থেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিবর্গ এমন ছিলেন, যারা প্রকৃতপক্ষে এই মহান নবী (সাঃ) কে পেয়েছিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ধর্মীয় আবেগও উন্মাদনাপূর্ণ একজন বুজুর্গ যুবক ছিলেন, যিনি একমাত্র ধর্মের খাতিরে নিজ ঘর-বাড়ী, আত্মীয়স্বজন ও নিজ মাতৃভূমি থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন। এই পথে এত কোরবানী (ত্যাগ) করেছিলেন যে, তার ব্যক্তি স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহতা'লার কিছু অন্য অভিপ্রায় ছিল। বাহ্যতঃ তার এই দাস বৃত্তির শিকল তাকে প্রকৃত স্বাধীনতার দিকে আকর্ষণ এবং নিজ জীবনের উদ্দেশ্যসাধন করেছিল। নিশ্চিতরূপে তার জীবন চরিত আমাদিগকে ধর্মকে পার্থিব বস্তুর উপর প্রাধান্য দেওয়ার স্পষ্ট শিক্ষা দেয়।

পুস্তিকাটি সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান মোকাররম ও মোহতরম ফরিদ আহমদ নবীদ সাহেব রচিত। এটি এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ। খুদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের প্রচার বিভাগ খিলাফত আহমদীয়ার শতবার্ষিকী জুবিলীর কল্যাণময় প্রাক্কালে পুস্তিকাটি প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। পুস্তিকাটির প্রস্তুতির জন্য মোকাররম মোদাস্‌সের আহমদ মুজাম্মিল সাহেব সহায়তা করেছেন। খোদাতা'লা তার পৃষ্ঠপোষক ও সহায় হোন এবং বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করুন।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
হাফেজ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ
খোখর
মুহ্‌তামীম এশায়াত মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রথম পারস্য দেশীয় মুসলমান ছিলেন। "আমার পিতা আমাকে এত বেশী ভালবাসতেন যে এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে চোখের আড়ালে থাকতে দিতেন না।" -হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) নিজ জীবন কাহিনী বর্ণনা করে বলেন।

সভা সম্পূর্ণ নীরব ছিল এবং সবাই মনোযোগ সহকারে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর জীবন কালের ঘটনাবলী শুনছিলেন। কেননা হযরত রসূল করীম (সাঃ) স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি (সাঃ) সমস্ত শ্রোতাগণকে মনোযোগ সহকারে এই ঘটনাবলী শুনতে নির্দেশ দিলেন।

"আমি ইস্পাহনের (ইরানের একটি বিখ্যাত শহর) একটি জন বহুল লোকালয় 'জায়' এর অধিবাসী। আমার পিতা এই অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার ছিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও ভালবাসতেন। এই কারণে আমাকে মেয়েদের মত ঘরে রাখা হত এবং এক মুহূর্তের জন্য চোখের আড়ালে রাখা হত না। একবার আমাদের গৃহ নির্মানের কিছু কাজ আরম্ভ হল, যাতে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গেলেন ও তাঁর পক্ষে ঘর থেকে বাইরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। অপর দিকে বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনাও জরুরী ছিল। সেহেতু আমার পিতা আমাকে নিজের কাছে ডেকে বললেন, আজ তুমি আমার জায়গায় চলে যাও, কিন্তু মনে থাকে যেন বেশী দেরি না হয়। কেননা তোমার অনুপস্থিতি আমাকে ব্যাকুল করে দেয়। সুতরাং আমি আমার পিতার নির্দেশানুযায়ী বাড়ী থেকে জমির দিকে রওনা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে আমি একটি গীর্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে খোদাপ্রেমিক কিছু খ্রীষ্টান উপাসনায় রত ছিলেন এবং তাঁদের প্রার্থনা ও অনুনয় বিনয়ের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে অনুসন্ধিৎসু ভাবের উদয় হল ও আমি গীর্জা ঘরের মধ্যে গেলাম এবং তাঁদের উপাসনা করা দেখতে থাকলাম যা আমার ভাল লাগল ও এর মধ্যে আমি মোহিত হয়ে গেলাম।

প্রকৃত পক্ষে, পিতৃ পুরুষদের ধর্ম অগ্নি উপাসনা আমাদের বংশে ছিল এবং আমরা অগ্নি উপাসনা করতাম। আমার প্রথম থেকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল এবং আমি স্বয়ং উপাসনায় সম্পূর্ণ রূপে অংশ গ্রহণ করতাম, এমন কি আমি অগ্নি পর্যবেক্ষণকারীরূপে নিযুক্ত ছিলাম অর্থাৎ আমি অগ্নিকুন্ডে সর্বদা আগুন জ্বলন্ত রাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলাম ও অতি সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পাদন করতাম। কিন্তু এটা এক বাস্তব সত্য ছিল যে আমার মন সর্বদা একটি মহৎ সুন্দর ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতির অনুসন্ধানে ছিল, কেননা অগ্নি উপাসনা আমার মনঃপুত ছিল না।

সেদিন গীর্জায় কিছু লোকজনকে উপাসনা করতে দেখে আমার অন্তর উদগ্রীব হয়ে গেল মনে হলো, এই ধর্ম নিশ্চয় আমাদের ধর্মের চেয়ে ভাল ও উৎকৃষ্ট। আমি নিজ কাজকর্ম সব ভুলে গিয়ে সেখানে থেমে গেলাম এবং সারাদিন ঐ সব খৃষ্টান সাধু ব্যক্তিদের সাহচর্যে কাটালাম, এমন কি সূর্যাস্ত হয়ে গেল ও রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেল। আমি খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম এবং তাদেরকে এটাও জিজ্ঞাসা করলাম,- আপনাদের ধর্মের কেন্দ্র ও উৎপত্তি স্থল কোন স্থানে? তাঁরা আমাকে বললেন, শাম (সিরিয়া) আমাদের মূল কেন্দ্র। তাঁরা আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক কথাবার্তা বললেন এবং এটা আমার ধর্ম পরিবর্তনের সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করার প্রথম উপলক্ষ রাতের বেলায় যখন বাড়ী পৌঁছালাম তখন দেখলাম সবাই আমার প্রতীক্ষায় রয়েছে। সবদিকে অনুসন্ধান করার জন্য লোক পাঠান হয়ে গিয়েছিল এবং ঘরে প্রবেশ করা মাত্র জিজ্ঞাসাবাদ করা হল- অবশেষে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলাম ইত্যাদি। আমি যথাযথ সমস্ত ঘটনা শোনালাম ও খৃষ্টান সাধু ব্যক্তিদের উপাসনা করার প্রশংসা করলাম। এই কথা শুনে আমার পিতা আমাকে বোঝানো আরম্ভ করে নিজ ধর্মের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার অন্তর তখন ঐ ধর্ম থেকে বিরাগ ভাজন হয়ে গিয়েছিল। আমি একথা প্রকাশ্যে খোলাখুলি ভাবে বলে দিয়েছিলাম। এই অভিপ্রায় শুনে আমার পিতা যেন চক্ষুহীন হয়ে গেলেন। আমাকে অত্যধিক ভালবাসা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি কঠোরতা আরম্ভ করে দিলেন ও এই ব্যাপারে কোন কথা শুনতে অগ্রাহ্য করলেন। যখন তিনি বুঝলেন, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ও আমার ভাবনা চিন্তার মধ্যে মতৈক্য নেই, তখন তিনি শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে আমাকে ঘরের মধ্যে আটক করে দিলেন। আমার পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়ে চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। যদিও আমাকে ঘরে বন্দী করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তবুও আমার অন্তর তখনও সত্য ধর্মের সন্ধানে ব্যাকুল হয়েছিল। সেজন্য আমি কোন প্রকারে সেই খৃষ্টান সাধুকে বলে পাঠালাম, যখন সিরিয়া অভিমুখে কোন 'কাফেলা' (যাত্রী দল) প্রস্থান করবে তখন অবশ্যই আমাকে বলে দেবে, যাতে আমি সত্য ধর্মের কেন্দ্রতে পৌঁছাতে পারি। ঘটনাক্রমে সেই সময় সিরিয়া দেশ থেকে কিছু ব্যবসায়ী আমাদের শহরে এসেছিলেন, গীর্জার লোকেরা তাঁদের সম্বন্ধে আমাকে খবর দিলেন। আমি স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলাম, যখন এই ব্যবসায়ী নিজ কাজ সমাধা করে প্রস্থান করবে তখন আমিও তাদের সাথে মিলিত হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যাব। সুতরাং আমি যখন

খবর পেলাম ঐ ব্যবসায়ীরা প্রস্থান করছেন, তখন আমি পা থেকে শিকল খুলে ফেলে গোপনে সিরিয়াগামী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলিত হলাম ও আমাদের যাত্রা শুরু হয়ে গেল। এটা ছিল ঐ সফরের শুরু যা অবশেষে আমাকে আমার প্রভু ও মালিক হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর চরণতলে পৌঁছে দিয়েছিল। যদিও তখন গন্তব্যস্থান পৌছানোর জন্য অনেক যাত্রা ও বিরতি আমার জন্য অপেক্ষমান ছিল।

কয়েকদিন যাত্রা করার পর আমরা সিরিয়া পৌঁছে গেলাম ও আমি জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও খোদা ভীতির দিক থেকে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? ঐ ব্যক্তিবর্গ আমাকে সবচেয়ে বড় পাদ্রী 'আসকাফ আজম' এর দিকে রওনা করে দিলেন যিনি আমার বিবরণ শুনে নিজের কাছে থাকার অনুমতি দিলেন।

আমি জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও খোদাভীতিতে উন্নতিসাধন করার জন্য ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করে বিদেশে সবেমাত্র বাসোপযোগী হয়েছিলাম। কিন্তু এই পাদ্রীর সাথে কিছুদিন থাকার পর আমাকে নিজের এইসব পরিশ্রম ও ত্যাগ বৃথা হতে দেখলাম, কেননা বাহ্যতঃ পুণ্যবান দৃষ্টিগোচর হলেও এই পাদ্রী প্রকৃত পক্ষে ঘোর সংসারী ও লোভী ছিল। ব্যবহারিক দিক থেকে তার পার্থিব লোভ লালসা দেখে আমার অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণা বোধের উদ্রেক হল। কিন্তু তখন প্রত্যাবর্তনের কোন পথ ছিল না। অতএব আমি প্রতীক্ষা করতে থাকলাম যেন খোদাতা'লা আমার জন্য কোন সঠিক পথ উন্মুক্ত করেন।

অতঃপর এমনি একদিন সেই পাদ্রীর মৃত্যু হল এবং লোকজন তাঁর অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করলেন। আমি যেহেতু ঐ পাদ্রীর সাথে থাকতাম, সেইজন্য আমার জানা ছিল, 'সাদকা ও খয়রাত' (দান) এর জন্য আসা স্বর্ণ-মুদ্রা ও রৌপ্য-মুদ্রা অনেকগুলি মৃৎপাত্রে সংরক্ষিত আছে। এখন যেহেতু তিনি মারা গিয়েছেন, এই জন্য আমি লোকজনকে এই কোষাগারের বিষয়ে বলে দিলাম যাতে ঐ সমস্ত মুদ্রা দরিদ্র লোকজনের মধ্যে বিতরণ করা যায়। শহরের লোকেরা তখন 'আসকফ আজম' এর এই ঘটনা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন ও প্রচন্ড ঘৃণা প্রকাশ করলেন।

ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর যিনি পাদ্রী নির্বাচিত হলেন তিনি একজন পুণ্যবান ও সাধু ব্যক্তি ছিলেন, যাঁর সাংসারিকতায় কোন আসক্তি ছিল না। সুতরাং আমি তাঁকে ভালবাসতে লাগলাম এবং সর্বদা তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতাম। কিন্তু ঐ পুণ্যবান পাদ্রীর জীবন রক্ষা পেল না এবং তাঁর শেষ সময় এসে গেল। আমি তাঁর সমীপে নিবেদন করলাম- এখন আপনি তো আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কিন্তু এটা তো বলুন, আপনার পরে প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান ও খোঁজ খবরের জন্য কার সমীপে আত্মনিয়োগ করব?- এই

কথা শুনে তিনি বলেন,- হে আমার প্রিয় বৎস! ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার জন্য আমি কর্মনিষ্ঠ ছিলাম, এখন তো সেটা অস্তিত্বহীন হয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণ নিজ ইচ্ছায় ধর্মের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে নিয়েছে এবং প্রকৃত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত নেই। আরও বলেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি একজন সাধু ব্যক্তির সাথে 'মাওসাল' এ সাক্ষাত করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ কর। অতএব পুণ্যবান ঐ সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর আমি মাওসাল পৌঁছালাম আর সেই পুণ্যবান সাধুর সেবায় নিয়োজিত হলাম। কিন্তু তখনও আমার গন্তব্যস্থান দূরে ছিল। সেজন্য ঐ রকম এক পুণ্য ব্যক্তির পর দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয় জনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে মাওসাল এর পর 'নাসিবায়েন' ও পুনরায় 'ওমুরিয়া'র এক পুণ্যবানের কাছে থাকতে লাগলাম। অবশেষে যখন 'ওমুরিয়া' র পুণ্যবান ব্যক্তির অন্তিম সময় উপস্থিত হল এবং আমি তখন তাঁকে অন্য কোন সাধু ব্যক্তিও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বলেন, এখন এই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তির সন্ধান আমার জানা নেই। তবে হ্যাঁ, আরব দেশে একজন নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে, যিনি তাঁর 'নবুওয়ত' প্রাপ্তির পর এমন এক স্থানের দিকে 'হিজরত' (দেশ ত্যাগ) করবেন যেখানে খেজুর প্রচুর পরিমানে পাওয়া যাবে। তাঁর তিনটি লক্ষণ মনে রেখ, তা থেকে তাঁকে চিনে নিও। প্রথমত তিনি 'সদকা' খাবেন না, দ্বিতীয়ত উপহার গ্রহণ করবেন, তৃতীয়ত তাঁর দুই কাঁধের মাঝখানে 'মোহর' এর ন্যায় একটি চিহ্ন থাকবে।

এটা আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক ছিল। কেননা ঐ পুণ্যবান ব্যক্তির মাধ্যমে আমি একজন বিশাল বড় নবীর আগমন বার্তা পেয়ে ব্যাকুল হয়ে গিয়েছিলাম যে যেমন করে হোক অতি সত্বর আরব ভূমিতে পৌঁছে যাব, যাতে আগত নবীর সাথে সাক্ষাত লাভ করতে পারি। অতঃপর একদিন আমার মনোস্কামনা পূর্ণ হল, যখন আমি জানতে পারলাম আরব থেকে আগত 'কবিলা কল্‌ব'-এর কিছু ব্যবসায়ী আরবের দিকে যাচ্ছেন তখন আমি ঐ সকল ব্যবসায়ীদের সাথে মিলিত হলাম এবং নিবেদন করলাম,- আমাকে আপনাদের সাথে নিয়ে চলুন। তারা বিনিময়ে (সাথে যাওয়ার জন্য) আমার কাছ থেকে ভেড়া ছাগল নিয়ে নিল এবং আমাকে তাদের সাথে নিয়ে আরবের দিকে রওনা হয়ে গেল।

যখন আমাদের যাত্রীদল 'কোরা' উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন আমার সঙ্গি ব্যবসায়ীদের নিয়্যতে ক্রটি দেখা দিল। তারা আমার ভেড়া ছাগল পূর্বেই নিয়ে নিয়েছিল তারপর আরও অত্যাচার এভাবে করল যে, 'কোবা' উপত্যকায় তারা আমাকে একটা ইহুদির কাছে ক্রীতদাস সাজিয়ে বিক্রী করে দিল এবং আমি যে এদিকে গন্তব্যস্থানের নিকট পৌঁছেছিলাম, কিন্তু ব্যবসায়ীদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ফলে একজন স্বাধীন ব্যক্তি

ক্রীতদাস হয়ে গেল। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)এর জীবন কাহিনীর এই অংশটুকু শুনে শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে এক ভাবাবেগের উদ্রেক হল এবং ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে ঐ মহান ব্যক্তিকে দেখতে লাগল, যিনি নিজ সুখস্বাচ্ছন্দ্য কেবল খোদাতা'লার জন্য খাঁটি ব্যাকুলতায় ত্যাগ করেছিলেন, যিনি একজন স্বাধীন মানুষ থেকে ক্রীতদাস হয়ে গিয়েছিলেন। যিনি একজন জমিদার ও নিজ অঞ্চলের সম্মানীয় বংশের সন্তান হয়েও আজ ইহুদির ক্রীতদাস। সত্য প্রেম তো একেই বলে।

সময় যেন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং সবাই এই ঘটনা পরিপূর্ণ রূপে কর্ণগোচর করছিলেন এবং অতঃপর কিছু বিরতির পর হযরত সলমান ফারসী (রাঃ)রই কণ্ঠস্বর নীরবতা ভঙ্গ করলো।

"আমি এখন 'কোরা' উপত্যকায় নিজ ইহুদি মালিকের দাসত্বে কালাতিপাত করছিলাম এবং বিগত দিন- গুলি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। কিন্তু আমি এই আশায় দিন কাটাচ্ছিলাম, হয়ত এটিই সেই অঞ্চল যার বর্ণনা আমায় সাধু ব্যক্তিটি বলে দিয়েছিলেন। 'কোরা' উপত্যকায় দাসত্বে কিছুদিন কাটানোর পর আমার ইহুদি মনিবের চাচাত ভাই তার সাথে সাক্ষাত করতে আসলেন। তিনি আমাকে পরিশ্রম ও সততার সাথে কাজ করতে দেখে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাকে ক্রয় করে নিলেন। এই ব্যক্তি 'ইয়াসরিব' (মদিনা) এর অধিবাসী ও ইহুদি ছিলেন এবং বনু কোরাইযা নামক গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এইভাবে আমি আমার নতুন মনিবের সাথে 'ইয়াসরিব'-এ এসে গেলাম, সেই ইয়াসরিব যার নাম 'মদিনাতুন্নবী'।

যদিও আমার তখনও এটা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। কিন্তু আমার গুরু আমাকে যে সমস্ত ভূমির সীমানা নির্দেশনার চিহ্ন বলেছিলেন, তার বেশীর ভাগ 'ইয়াসরিব' এর মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং আমার আশা-আকাঙ্খা আর একবার প্রাণবন্ত হয়ে গেল এবং খোদাতা'লার নিয়তির প্রতীক্ষায় থাকলাম।

এটা সেই যুগ ছিল যখন রসূল করীম (সাঃ) নবুওয়তের দাবী করেছিলেন এবং তাঁর (সাঃ)এর বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছিল। মুসলমানগণকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল এবং অবশেষে আল্লাহতা'লা মুসলমানগণকে 'হিজরত' করার আদেশ প্রদান করলেন।

হুজুর আকরম (সাঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশ অনুসারে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাথে মক্কা থেকে বাহির হলেন এবং আল্লাহর 'হেফাজত'-এ (সংরক্ষণে) যাত্রা শেষ করে অবশেষে মদিনা মানোয়ারার কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত 'কোবা' নামক গ্রামে পৌঁছিলেন ও শিবির স্থাপন করলেন। কোরা থেকে অদূরে বনু কোরাইযার খেজুর

বাগান ছিল, যেখানে আমি ইহুদি মনিবের জমিতে কাজ করতাম। সেদিনও যথারীতি আমি নিজ কাজে রত হয়ে একটি খেজুর গাছের মাথায় চড়ে খেজুর ছিঁড়ছিলাম। আমার মনিব গাছের তলায় বসে কাজের তদারক করছিলেন। অকস্মাৎ আমি দেখলাম, আমার মনিবের এক আত্মীয় দ্রুত পদক্ষেপে আমার দিকে এলেন এবং 'আনসার' গোত্রকে গালিগালাজ করে আমার মনিবকে বলতে লাগলেন- এই সব লোক কোবায় এক ব্যক্তির কাছে একত্রিত হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী বলছেন আর আজকেই তিনি মক্কা থেকে এখানে পৌঁছেছে। ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে এরূপ কথাবার্তা শুনে আমি যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আশা-আকাঙ্খায় আমার শরীর এক রকম কম্পমান হয়ে গেল আর আমার মনে হল যেন গাছ থেকে নিচে পড়ে যাব। আমার এক অদ্ভুত অবস্থা ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমি কি করব আর কি না করব ও মনের অবস্থা কাকে বলব। আমি ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে গাছ থেকে নেমে এলাম এবং মনিবের আত্মীয়কে যিনি সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন- জিজ্ঞাসা করলাম,- আপনারা কি বলছিলেন? আমার মনিব যখন আমার আগ্রহ ও অস্থিরতা দেখলেন, তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে আমাকে সজোরে চড় মেরে বললেন- এই ব্যাপারে তোমার এত কৌতুহল কেন? তুমি যাও আর নিজের কাজ কর।

আমার কোন কৌতুহল নেই এই ব্যাপারে? আমি মনিবের কথা শুনে নিজে মনে মনে চিন্তা করলাম। আমি-যে নিজে এই মুহূর্তের জন্য সমস্ত জীবন নিঃশেষ করে দিচ্ছিলাম। সেই নবীর সাক্ষাত লাভের জন্য গ্রামে গঞ্জে, লোকালয়ে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। আমার অবস্থা তো সেই প্রবাসীর মত যে মরুভূমিতে পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং যখন সে নিজ জীবনের উপর নিরাশ হয়ে যায় তখন হঠাৎ তার সামনে গন্তব্যস্থান দৃষ্টিগোচর হয় বরং আমি তো সম্ভবত এর চেয়ে বেশী আনন্দিত ছিলাম। কিন্তু ঘোর সাংসারিক ব্যক্তি এই বিষয়টি কেমন করে বুঝতে পারে? তখন আমার জীবনের একটাই উদ্দেশ্য ছিল, কি ভাবে নবী আরবী (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে (সাঃ) দেখব এবং সন্ধান করব, ইনি কি সেই নবী যাঁর খবর আমার পূর্ববর্তী সাধু সন্ন্যাসীরা আমাকে দিয়েছিলেন। সুতরাং রাত হওয়া মাত্রই আমি খাওয়ার জিনিসপত্র নিয়ে কোবা অভিমুখে হুযুরের বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছিলাম এবং খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপন করে নিবেদন করলাম- আমি জানতে পারলাম যে, আপনি আল্লাহর একজন পুণ্যবান ব্যক্তি এবং কোবায় অবস্থান করছেন। আপনার নিকট কিছু দরিদ্র ও অভাব গ্রস্ত সাথীও আছেন। অতএব আমি 'সদকা' রূপে এই খাবার নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। যদি এটা গ্রহণ করেন তাহলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। আমি এটা দেখতে চাইছিলাম, তিনি (সাঃ) সদকা খান কি না। আমার আনন্দের কোন সীমা থাকল না যে, হুযুর আকরম (সাঃ)

সেই খাবার নিজ আসহাবগণকে (সাথী সঙ্গীদের) দিয়ে দিলেন এবং নিজে তার থেকে কিছু খান নি। এখন দ্বিতীয় লক্ষণও আমার মনে ছিল। অতএব পরবর্তীতে আমি একটি থালায় কিছু খেজুর সাজিয়ে তাঁর (সাঃ) এর সেবায় উপস্থিত হলাম এবং নিবেদন করলাম হুযুর, আমি দেখেছিলাম আপনি (সাঃ) সদকা খান না। অতএব আপনার জন্য এই তোহ্ফা (উপঢৌকন) নিয়ে এসেছি। দয়া করে এটা গ্রহণ করুন! এই কথা শুনে হুযুর (সাঃ) তোহ্ফা গ্রহণ করলেন এবং এর মধ্য থেকে কিছু তিনি খেলেন এবং সাহাবাগণকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন।

আমি মনে মনে এই লক্ষণগুলি পরিপূর্ণ হওয়াতে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এবং আমার মনে হচ্ছিল আমার গন্তব্যস্থান নিকটবর্তী। আর একটি মাত্র শেষ লক্ষণ যা আমাকে আমার গুরু বলেছিলেন, সেটা বাকী ছিল। আর যদি সেই লক্ষণ দেখতে পাই, তাহলে সারা দুনিয়ার আনন্দ পেয়ে যাব এবং এই লক্ষণ তাঁর কাঁধের মাঝে বিদ্যমান ছিল।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর আগমনের কিছু দিন পর হযরত কুলসুম বিন আল-হাম্দ আল-আনসারীর মৃত্যু হল। তার 'জানাযা' (মৃত দেহ) ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনি স্বয়ং যোগদান করেছিলেন এবং ঐ সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজ সাথি সঙ্গিদের সাথে 'জান্নাতুল বাকী' তে উপস্থিত ছিলেন, আমিও সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম এবং হজুর (সাঃ) এর নিকটে পৌঁছে তাঁর (সাঃ) শরীরে বিদ্যমান চারটি লক্ষণের মধ্য থেকে সেই লক্ষণটি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করতে লাগলাম এবং অতঃপর এক মুহূর্তের জন্য গায়ের চাদর সরে গেলে তাঁর (সাঃ) কোমরে বিদ্যমান সেই লক্ষণ দেখে নিলাম, যা আমার অনুসন্ধানে ছিল। আমার চক্ষুযুগল হতে অশ্রুধারা বইতে লাগল। আমি হুযুর আকরম (সাঃ) এর সেবায় উপস্থিত হয়ে অস্থির চিত্তে ক্রন্দন ও চুম্বন করতে লাগলাম। হুযুর (সাঃ) যখন এই অবস্থা দেখলেন তখন আমাকে তিনি (সাঃ) সম্মুখে বসালেন এবং আমার এই অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। আমি বেদনাদায়ক কাহিনী শ্রুতিগোচর করানো আরম্ভ করলাম, তখন হুযুর আকরম (সাঃ) অন্যান্য সাহাবাগণকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন, নীরবতা সহকারে এই ঘটনাবলী শ্রবণ করুন! সুতরাং আমি সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর হাতে 'বয়াত' (শিষ্যত্ব গ্রহণ) করে মুসলমান হয়ে গেলাম। যে ভাবে হোক আমার ইহুদি মনিবের নিকট থেকে মুক্তি-লাভ এবং নিজেকে হুজুরের 'গোলামী' (দাসত্বে) তে প্রকাশ্যে সমর্পণ করব। কিন্তু এই মনস্কামনা পূর্ণ হতে দীর্ঘ দিন লেগে গেল, কেননা আমার ইহুদি মনিব আমাকে মুক্ত করতে প্রস্তুত ছিলেন না এবং এই কারণে 'বদর' ও 'ওহোদ' এর যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করতে পারিনি। অতঃপর রসুল করীম (সাঃ) আমাকে আমার মনিবের নিকট হতে মুক্তি লাভের জন্য পত্রালাপ করার পরামর্শ

দিলেন, যার অর্থ এই যে, ক্রীতদাস তার মনিবকে টাকা-পয়সা দিয়ে অথবা কোন বড় কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে মুক্ত হতে পারে। অনুরূপ ভাবে আমি আমার মনিবের সঙ্গে পত্রালাপ করলাম। অবশেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তিনি রাজি হলেন এবং এই শর্ত আরোপ করলেন, আমি আমার মালিকের তিনশত খেজুর গাছের চারা রোপন করে দিব এবং বাগানে এই খেজুর চারা গুলি রোপন করে দিলে আমি মুক্তিলাভ করব।

আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক আমার মালিক হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর জন্য। তিনি যখন এই শর্ত শুনলেন তখন সমস্ত সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন, আপনাদের এই ভাইয়ের মুক্তির জন্য তাঁকে সাহায্য করুন! অতএব সমস্ত সাহাবাগণ নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী খেজুর চারা সরবরাহ করলেন। আমরা সবাই মিলে গর্ত খুললাম এবং যখন তিনশত গর্ত খোঁড়া হল, তখন আমরা হুজুর (সাঃ) এর নিকট সংবাদ পাঠালাম। তিনি (সাঃ) স্বয়ং শুভাগমন করলেন। সাহাবারা একটা একটা করে চারা গাছ তাঁর (সাঃ) এর হাতে ধরিয়ে দিলেন এবং হুজুর (সাঃ) স্বয়ং পবিত্র হাত দিয়ে সেই চারাগুলিকে গর্তে রাখতে লাগলেন। এই রূপে সমস্ত চারাগাছ গুলি নিজ হাতে রোপন করলেন এবং আমি শপথ করে বলছি, এই সমস্ত চারাগাছ বড় হয়ে গেল এবং এর মধ্যে থেকে একটি চারাও বিনষ্ট হয়নি।

এই প্রকারে আমি নিজ ইহুদি মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হলাম এবং নিজ মালিক ও প্রভু হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) এর পরিপূর্ণ দাসত্বে এসে গেলাম এবং অবশেষে সেই গন্তব্যস্থান এসে গেল যার স্বপ্ন আমি যুবক বয়সে দেখেছিলাম। আজ আমার সমস্ত যাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত মনে হচ্ছিল। পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও দুঃখ-কষ্ট যেন ধোঁয়ার মত উড়ে গিয়েছিল। আমি আজ সফলতা লাভ করেছি। আমার খোদা আমার প্রকৃত আবেগ ও প্রবণতার যথোচিত মূল্যায়ণ করে আমাকে আমার প্রিয় নবীর পদতলে পৌঁছে দিয়েছেন। যদিও কখনও কখনও এক মুহূর্তের জন্য নিজ বাড়ীর লোকদের জন্য অভাব অনুভব হত এবং মনে মনে ভাবতাম আমার কোন ঘর-বাড়ী, প্রিয়জন বা আত্মীয়-স্বজন নেই। কিন্তু এই চিন্তা-ভাবনা এক সময় চিরতরে শেষ হয়ে গেল। প্রথমতঃ যখন হুজুর (সাঃ) আমাকে আবুল দারদা আনসারী (রাঃ) এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দ্বীনী (ধর্ম্মীয়) ভাই বানিয়ে দিলেন এবং পরে খন্দক যুদ্ধের প্রাক্কালে হুজুর (সাঃ) এই দুর্বল গোলাম সম্বন্ধে এই নির্দেশ দিয়ে বললেন-

"سَلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَيْتِ"

"সালমানো মিন্না আহ্লাল বায়েত" অর্থাৎ সালমান (রাঃ) আমাদের, এই জন্য তাকে আমাদের 'আহ্লে বায়েত' (রসুলুল্লাহর পরিবারস্থ লোকজন)এর অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

নিজের একজন দুর্বল গোলামের প্রতি এইরূপ উদারতা ও ভালোবাসা। হুজুর আকরম (সাঃ) এর মধ্যে অন্তর্ভুক্তির সৌভাগ্য লাভ নিঃসন্দেহে এমন ছিল যে, এতে আমার শত-সহস্র ভালোবাসা ও আত্মীয়তা ত্যাগ অনেক ছোট মনে হচ্ছিল এবং আমি আল্লাহতা'লার 'শোকর' (কৃতজ্ঞতা) জ্ঞাপন করতে থাকলাম।

এখন আমার জীবন এক নতুন পথে চলতে লাগল। আমার তীব্র মনস্কামনা ছিল যে বেশিরভাগ সময় যেন রসুল করীম (সাঃ) এর সান্নিধ্যে কাটাই। অতএব আমি অন্যান্য কিছু বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মসজিদ নব্‌বী সংলগ্ন একটি মাচানের উপর উপস্থিত থাকতাম যেখানে সর্বদা ধর্মীয় কথাবার্তা হত এবং যখন হুজুর (সাঃ) আগমন করতেন তখন আমরাও তাঁর (সাঃ) এর সেবায় নিয়োজিত হয়ে যেতাম। আরবী ভাষায় মাচানকে 'সুফফা' বলে, এইজন্য লোকেরা আমাদের নাম 'আসহাবে সুফফা' রেখে দিয়েছিল। এটা আমার জীবনের মূল্যবান সময় ছিল, কেননা একদিকে আমার প্রিয় নবীর নৈকট্য ও ভালোবাসা ছিল, অপর দিকে সকল প্রকার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি, শুধু ধর্মের জন্য সময় কাটানোর সুযোগ পাচ্ছিলাম। কিন্তু আগামী দিনের জন্য অনেক দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারিত ছিল।

আর এই সবের সূচনা ৫ম হিজরীর শওয়াল মাস থেকে সংঘটিত আহ্‌যাব বা খন্দকের যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। এই সবেতে আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় আমি প্রচুর কাজ করার 'তৌফিক' (শক্তি সামর্থ্য) লাভ করেছি।

হুজুর আকরম (সাঃ) এই বার্তা পেলেন যে, মক্কার কাফেররা অনেক গোত্রকে নিজেদের সাথে একত্রিত করে একটি বড় সৈন্যদল গঠন করে মদীনার উপর আক্রমণোদ্যগী। প্রায় ২৪০০০(চব্বিশ হাজার) সৈন্য নিয়ে গঠিত এই সৈন্যদলের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের নাম ঠিকানা মুছে দেওয়া হবে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ছিল, এইজন্য হুজুর আকরম (সাঃ) আল্লাহতা'লার নির্দেশে,

"شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"

"শাওয়ের্‌হুম্ ফিল্ আমর্" এর বিবেচনায় সমস্ত সাহাবাগণকে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত করলেন এবং পরামর্শ চাইলেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে মদীনা শহরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণরূপে আমার ছিল এবং এটা জানতাম, এতবড় সৈন্যদলে সোজাসুজি সংঘর্ষের পরিবর্তে তাকে অন্য কোনভাবে প্রতিহত করা যথোপযুক্ত হবে। অতএব আমি ইরানীয় যুদ্ধের প্রচলিত রীতি মনে রেখে হুজুর আকরম (সাঃ) এর সমীপে এই প্রস্তাব উত্থাপন করলাম, যদি মদীনার

উত্তর প্রান্তে একটি প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়, তাহলে শহরকে রক্ষা করা যেতে পারে, কেননা উত্তর দিকটা একমাত্র এমন ছিল, যেদিক থেকে কোন বড় সৈন্যদল আক্রমণোদ্যগী হতে পারত, কিন্তু মদীনার অন্যান্য প্রান্ত থেকে ভৌগোলিক কারণে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। হুজুর (সাঃ) এই পরিকল্পনার সবদিক বিবেচনা করে এটা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন এবং পরিখা খননের নির্দেশ দিয়ে এই কাজ সাহাবাদের বিভিন্ন দলের উপর ন্যস্ত করলেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে কাজের সূচনা করলেন।

প্রচন্ড শীতের সময় ছিল। কিন্তু সাহাবারা নিজেদের প্রিয় নবী (সাঃ) এর নির্দেশে কর্তব্য সম্পাদন করতে দিন রাত এক করে নিমগ্ন হয়ে গেলেন এবং এই সব দেখে তাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রিয় মালিকও প্রতি মুহূর্ত তাদের সাথে এইসব কাজে যুক্ত ছিলেন এবং তত্ত্বাবধান করার সাথে সাথে স্বয়ং নিজ হাতে কাজও করছিলেন। এইরূপে অবিরত ছয় দিন রাত কাজ করে এই পরিখা খনন সম্পূর্ণ হল। যখন কাফেরদের বিশাল সৈন্যবাহিনী মদীনাকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখছিল এখানে পৌঁছে বিস্মৃত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেল, চক্ষু ছানা বড়া হয়ে গেল। এত বিশাল লম্বা ও চওড়া পরিখা অতিক্রম করা তাদের সাধ্যের বাইরে ছিল তখন বাধ্য হয়ে সেখানেই পরিখার নিকট অস্থায়ী শিবির স্থাপন করল এবং ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা চিন্তা করতে লাগল। হুজুর আকরম (সাঃ)ও তিন হাজার সাহাবা সঙ্গে নিয়ে এদিকে শিবির স্থাপন করলেন এবং কাফেরদের তৎপরতা নিরীক্ষণ করতে থাকলেন।

মক্কার কাফেররা মদীনা অবরোধ করে এমন জায়গার অনুসন্ধান আরম্ভ করল যেখান থেকে মদীনা আক্রমণ সম্ভব হয় এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে মদীনা সংলগ্ন ইহুদি গোত্র বনু কোরাইযাকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে নিল অথচ রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে এই সব গোত্রের যুদ্ধ না করার সন্ধি হয়েছিল। মদীনার বাইরে একটি বিশাল সেনাবাহিনী ও মদীনার ভিতর থেকে বনু কোরাইযার বিশ্বাসঘাতকতা বাহ্যত যুদ্ধের ছক সম্পূর্ণ কাফেরদের অনুকূলে চলে গিয়েছিল এবং দুর্বল ঈমানের লোকজন ও মুনাফেকরা (কপট) প্রকাশ্যে বলতে লাগল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতিশ্রুতি ভুল সাব্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে পরিপূর্ণ মোমেনরা (বিশ্বাসি) আল্লাহতা'লার উপর নির্ভর করেছিলেন এবং জানতেন অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন এই নিয়তি অটল-আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল জয়যুক্ত হবেন এবং শত্রুরা বিফল মনোরথ হবে। সুতরাং বাহ্যিক প্রত্যাশা যতদূর সম্ভব শেষ হয়ে যাচ্ছিল আর খোদাতা'লার উপর তাদের ঈমান আরো দৃঢ় ও গভীর হয়ে যাচ্ছিল।

শত্রুপক্ষ থেকে দিবারাত্রি এই প্রয়াস ছিল যেমন করে হোক পরিপাটি রূপে আক্রমণ

করা, কিন্তু ছোট ছোট আক্রমণ ব্যতীত যাতে কিছু লোক ক্ষয়ও হয়েছে, বড় আক্রমণ সম্ভব হয়নি, দিন এমনি এমনি কাটতে লাগল এবং মিত্র বাহিনির উৎসাহ শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এই সৈন্যদল যেহেতু বিভিন্ন গোত্রের সংমিশ্রণ ছিল এবং মুসলমানদের শত্রুতা ছাড়া আর কোন কারণে অংশ গ্রহণ বা ভক্তি-ভালোবাসা পারস্পরিক ছিল না। যেমন যেমন দিন অতিবাহিত হতে লাগল পরস্পর ভূল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হতে থাকল এবং অবশেষে সৈন্যদলে সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা দিল এবং ঠিক সেই রাতে যখন অবিশ্বাস চরমে পৌঁছে গিয়েছিল, খোদাতা'লার পক্ষ থেকে অত্যন্ত এক প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড় বহিতে থাকল যার দ্বারা কাফেরদের ছাউনিতে হৈচৈ আরম্ভ হয়ে গেল। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে তাঁবু ফেটে গেল। তাঁবুর বেড়া ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। বালি, মাটিও কাঁকর মিলে যেন বৃষ্টির মত কাফেরদের সৈন্যদলকে বিপর্যস্ত করে দিল। ঐ সমস্ত আগুনও নিভে গেল যা সৈন্যদলের শ্রেষ্ঠত্ব চিহ্ন হিসাবে প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। ঐ সমস্ত লোকেদের অন্তরে প্রথম থেকে একে অপরের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল, ভীষণ ভয় ও কম্পন প্রকাশিত হল এবং এই সৈন্যদল যারা মদীনাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসছিল, সকাল হওয়ার পূর্বে স্নায়বিক দুর্বলতায় দমে গিয়ে ময়দান ছেড়ে চলে গেল।

আমি গ্রামে গঞ্জে সত্য ধর্মের অনুসন্ধান করতে করেতে অবশেষে ইসলামে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিলাম। প্রতিটি স্বাচ্ছন্দ ও আরামে হুজুরের সমক্ষে থাকতাম এবং যতদূর সম্ভব তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করতাম। এই সময় যা আমি আমার প্রিয় মালিকের সমক্ষে কাটিয়েছি, সেটা আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি ও সম্পদ ছিল। কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না, একদিন আমার জীবদ্দশায় প্রিয় নবী (সাঃ) এর বিচ্ছিন্নতার দিন দেখতে হবে। মক্কা বিজয়, ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করল। লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল এবং অতঃপর একদিন অকস্মাৎ আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) বিদায় লাভ করে নিজ সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর নিকট হাজির হয়ে গেলেন। পৃথিবী যেন আমার নিকট অন্ধকার হয়ে গেল। অন্যান্য সাহাবাদের ন্যায় আমিও গভীর শোকে আত্মহারার মত হয়ে গেলাম এবং এক মুহূর্তের জন্য এই রকম মনে হল যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেছে কিন্তু পরমুহূর্তে আল্লাহতা'লা খেলাফতে রাশেদার মাধ্যমে ভয়কে শান্তিতে রূপান্তরিত করে দিল এবং ইসলাম উন্নতি করতে লাগল। কিন্তু মদিনায় আমার প্রেমাস্পদের স্মরণে এত কষ্ট পেতাম মন ব্যাকুল হয়ে যেত। পরবর্তীতে যখন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর যুগে ইরাকে বসবাস করার সুযোগ পেলাম, আমি ইরাকে বসবাস গ্রহণ করলাম যাতে একদিকে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে পারব এবং অন্যদিকে সেখানে নও মুসলিমদের শিক্ষা দীক্ষার কাজ করতে পারব। ইরাক ও ইরানের যুদ্ধাভিযানে আমার অংশ গ্রহণ

ইসলামি সৈন্যদলের জন্য এইদিক দিয়ে উপযুক্ত ছিল, আমার ঐ সব অঞ্চল সম্বন্ধে অধিক তথ্যজ্ঞান ছিল এবং ফারসি ভাষা জানার কারণে নিজ দেশবাসীকে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে পারতাম।

অতএব আমার এই অভ্যাস ছিল, যখন কোন অঞ্চলে অগ্রসর হতাম তখন প্রথমে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ইসলামের সাধারণ শিক্ষা জ্ঞাত করাতাম। যদি তারা চায় শত্রুতা ছেড়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারে। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) ঐ সমস্ত অভিযানে ইসলামি সৈন্যদলের দায়ী (আহ্বানকারী) ও 'রায়েদ' (বাহাদুর) পদ দানে ভূষিত করেন। দায়ী পদমর্যাদানুসারে আমার কাজ ছিল কাফেরদের কাছে ইসলামের শিক্ষা পৌঁছানো এবং রায়েদ পদমর্যাদা অনুসারে সৈন্যদল ও জানোয়ারদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করতাম এবং সাধারণত আমি প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। রায়েদ পদমর্যাদা অনুসারে প্রথম যুদ্ধ 'বোয়েব' ছিল, যেখানে আমরা ইরানি সৈন্যদলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বেরিয়ে ছিলাম। প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর অবশেষে ইরানি সৈন্যদল পরাজিত হয় এবং আল্লাহতা'লা আমাদিগকে বিজয়ী রূপে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। এরপর ১৪হিজরীতে আমি কাদেসিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে তৌফিক (সামর্থ্য) লাভ করি, যেখানে মুসলমানদের ৩০হাজার সৈন্যের বিরূদ্ধে ইরানিদের এক লাখ কুড়ি হাজার সৈন্য ছিল। হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাঃ) এই যুদ্ধে মুসলমানদের সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহতা'লা মুসলমানদের কম সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও তাদের একটি বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় দান করেন এবং ইরানের মত সুপার পাওয়ার (মহাশক্তি) অবধারিতরূপে পরাস্ত হয় এবং মুসলমান সৈন্যদল বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে করতে অবশেষে ইরানী রাজধানী মাদায়েনের নিকট পৌঁছালো এবং ১৬ হিজরীতে ইরানের রাজধানী মাদায়েন জয় করল। আমরা আল্লাহতা'লার এই অনুগ্রহরাজির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। মাদায়েন বিজয়ের এক বছর অবধি এই শহর ইরাকের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। কিন্তু এখানকার জলবায়ু আরব সংগ্রামকারীদের বেশি উপযোগী ছিল না এবং তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর নির্দেশে আমি ও হুযায়ফা বিন ইমান কোন একটি এমন স্থানের সন্ধানে বাহির হলাম, যেখানকার জলবায়ু উপযুক্ত হবে আর পশু-প্রাণীদের জন্য পর্যাপ্ত পশুখাদ্য মজুত থাকবে। সুতরাং আমরা উভয়ে যথেষ্ট প্রচেষ্টাও অনুসন্ধান করার পর একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করলাম এবং সেখানে ইসলামি সৈন্যদলের বসবাসের জন্য একটি নতুন শহর আবাদ করা হল যার নাম রাখা হল 'কুফা'।

আমি নিজ যোগ্যতানুসারে এবং আল্লাহতা'লা প্রদত্ত সামর্থ্যানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করছিলাম এবং স্বীয় কাজে সন্তুষ্ট ছিলাম, সমসাময়িক খলিফার পক্ষ থেকে এক বড়

দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে মাদায়েনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। যদিও এটা অনেক বড় কাজ ছিল। কিন্তু শুধু আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে আমি এই দায়িত্ব অতি সুন্দররূপে সম্পাদন করতে সামর্থ্য লাভ করেছিলাম। আমার প্রচেষ্টা এই ছিল, ঐ সেবার বিনিময়ে যা কিছু বেতন পাব, সেটা খোদাতা'লার রাস্তায় খরচ করে দিব এবং স্বয়ং নিজ হাতে পরিশ্রম করে মজুরি উপার্জ্জন করব। সুতরাং আমি গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও বস্তা বিক্রি করতাম ও এই উপার্জ্জিত অর্থে নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এই সম্বন্ধে জানতে পারলেন, তখন তিনি সহানুভূতির খাতিরে আদেশ দিয়ে এই কাজ বন্ধ করে দিলেন।

আমি সরল সহজ প্রকৃতির লোক ছিলাম। অতএব গভর্নর হওয়ার পর আমি একই আচার-ব্যবহার বজায় রাখতাম এবং কখনও আমি মনে মনে এটা ভাবিনি, আমাকে জনসাধারণের উপর প্রশাসক করে দেওয়া হয়েছে। আমি তো কালও সেবক ছিলাম এবং আজ গভর্নর হওয়ার পরও একজন সেবক। আমি জনগণের কাজ করে তাদের সাহায্য করে তৃপ্তি পেতাম। এই সরলতা ও সহজ ভাবের জন্য একদিন এক বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এমন এক ঘটনা ঘটল, এক ব্যক্তি যিনি অপরিচিত ছিলেন এবং কোন অন্য অঞ্চল থেকে মাদায়েন এসেছিলেন, তার মালপত্র উঠানোর জন্য মুটের আবশ্যক হোল। আমি সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই অপরিচিত ব্যক্তি আমার সাদাসিধে মুখাবয়ব দেখে আমাকে মজদুর অনুমান করল এবং বললেন, আমার এই মাল-পত্র উঠিয়ে অমুক জায়গায় পৌঁছে দাও। আমিও তাকে বলিনি, আমি এখানকার গভর্নর এবং চুপ-চাপ মালপত্র উঠিয়ে তার সাথে রওনা হলাম। শহরের লোকেরা যখন এই অবস্থা দেখল, তখন ঐ ব্যক্তিকে মূল ব্যাপার বলল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। সেই অপরিচিত ব্যক্তিটি হতবাক হয়ে গেল এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগল, আমি অযথা আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, কোন ব্যাপার নয়, এখন তো আমি তোমার মালপত্র গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসব। অতএব অজস্র পীড়া পীড়ি করা সত্ত্বেও আমি তাই করলাম। জনসাধারণ এই ব্যাপারে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের যুগে শেষ বৎসরে আমার বিবাহ করার চিন্তা-ভাবনা হল এবং এই অনুভব হল, একাকীত্ব দূর করার জন্য একজন সাথী হওয়া আবশ্যক। এই ভাবে আমি বনি কুন্দা বংশে বিবাহ করলাম। আমার স্ত্রীর নাম বকিরা এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সে এক পূণ্যবতী ও সাধারণ কাজ-কর্মের বিচক্ষণ মহিলা ছিল।

আমি তো এতদিন পারিবারিক দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত ছিলাম, এখন এই দায়বদ্ধতা চালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করতে লাগলাম। ইতিপূর্বে আমার মনে গৃহ নির্মাণ করার চিন্তা-ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন আমি একটা ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করলাম, যাতে সানন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারি। আল্লাহতা'লার অনুগ্রহে তাই হল। যদিও আমি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। রসুলুল্লাহর নিকট সম্বন্ধ হওয়ার কারণে হযরত ওমর (রাঃ) আমার পেনশন বদরী সাহাবাদের সমান নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলেন। এমনি আমার জীবন আল্লাহর অনুগ্রহে খুব সুন্দরভাবে কাটছিল। এখন অতীতের কঠিন পরিস্থিতি শুধুমাত্র স্বপ্ন হয়ে গেছে, কেমন করে ইরান থেকে রওনা হয়ে আরব ভূমিতে পৌঁছিলাম। স্বাধীন থেকে দাসত্বে এবং পুনরায় মালিক (সাঃ) এর মাধ্যমে দাসত্ব থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীন যাত্রা যদিও দীর্ঘ ছিল। কিন্তু এখন জীবনের এই বাঁকে পৌঁছে এইসব কিছু শুধু স্মৃতি হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত হয়ে গিয়েছিল এবং জীবন সফল ও নিশ্চিন্তে অতিবাহিত হচ্ছিল"।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) র জীবন কাহিনী আপনারা শুনলেন। সেই মহামানব যিনি শুধু আল্লাহতা'লার উপর আস্থা ও নির্ভর করে সেই পথ বেছে নিয়েছিলেন, যা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টদায়ক পথ ছিল। নিজে সব কিছু হাতের নাগালের মধ্যে রেখে সত্য ধর্ম ও সত্য নবীর সন্ধানে বাহির হয়ে গিয়েছিলেন, পথে কোন অসুবিধা তার সংকল্প ও উদ্দীপনা হ্রাস পায় নি। অতঃপর বিশ্ববাসী দেখেছে, আল্লাহতা'লা তার সত্যিকার আবেগ অনুভূতি বিনষ্ট হতে দেন নি। তিনি শুধু রসুলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎলাভে কৃতকার্য হন নি বরং হুজুর (সাঃ) তাঁর প্রতি স্নেহশীল হয়ে 'আহলে বায়েত' এর মধ্যে স্বীকৃতি অর্জন করেন। শুধু এটাই নয় পক্ষান্তরে হুজুর (সাঃ)আল-জুমুয়ার তফসীর প্রসঙ্গে তাঁর কাঁধে হাত রেখে এই বিরাট ভবিষ্যদ্বাণী করেন-

"যদি ঈমান সপ্তর্ষি মন্ডলে উঠে যায় তাহলে তার [সালমান ফারসী (রাঃ)] জাতির এক ব্যক্তি সেটা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে"।

যেমন আপনারা সবাই, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্ত্বায় পরিপূর্ণ লাভ করেছে, যিনি পারস্য বংশের ছিলেন। তার বংশধর ইরান থেকে 'হিজরত' (দেশত্যাগ) করে ভারতবর্ষে বসবাস করেন। মোটকথা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) যদিও দেরীতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং প্রাথমিক দিকে অনেক প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু আল্লাহতা'লা তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসকে ফলবতী করেন, স্পষ্ট সেবা করার সামর্থ্য লাভ করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) তাকে মাদায়েনের গভর্ণর নিযুক্ত করেন এবং এখানেই

তাঁর বিয়ে বনু কান্দার এক পরিবারের একজন সম্মানীয়া মহিলা বকিরার সাথে হয়েছিল। হিজরী ৩৩সনে ভ্রাতৃত্বের ফলে তার ভাই হওয়া রসুল (সাঃ) এর মহান সাহাবী হযরত আবু দরদা (রাঃ) দামেস্কে (সিরিয়া) পরলোকগমন করেন। তখন তিনি শোক-জ্ঞাপন করার জন্য সিরিয়া গমন করেন।

৩৫ হিজরীতে তাঁর মৃত্য হয় মাদায়েনে । হযরত সাদ বিন আবি ওকাস (রাঃ) জানাযার নামায পড়ান এবং মাদায়েনে অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মাজার এখনও সেখানে বিদ্যমান এবং এই অঞ্চলকে "সালমান পাক" বলা হয়। এই স্থানে আগত পূণ্যার্থীরা দোয়া করার জন্য তাঁর মাজারে অবশ্যই যায়।

তাঁর উত্তরাধিকারীর মধ্যে স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা রেখে গিয়েছেন। একটি কন্যার বিবাহ ইসপাহানে যদিও বাকী দুজনের মিশরে হয়।

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর এই সম্মান অনেক বড় ছিল, তিনি পারস্যবাসীদের মধ্য থেকে সবচেয়ে প্রথম মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁর 'নেকি' (পূণ্য), জ্ঞান ও 'তাক্বওয়া' (খোদাভীতি)র কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর খলিফারা হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর সাথে ভালোবাসা এবং স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন।

তাঁর জীবন খোদাতা'লা ও তাঁর রসুল (সাঃ) এর প্রেমের এক জীবন্ত ছবি ছিল। এটা আল্লাহতা'লার প্রতি খাঁটি ভালোবাসা, প্রেম ও তার সাথে মিলিত হওয়ার প্রগাঢ় উন্মাদনা ছিল। যিনি নিজ গৃহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ পরিবেশ ত্যাগ করে জনবসতি ও অরণ্যে ঘোরাফেরা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

'ইশ্‌ক হ্যায় জিন সে হুঁত্বয় ইয়ে সারে জঙ্গল পুর-খতর।
ইশ্‌ক হ্যায় জো সর ঝুকা দে যের তেগ আব্‌দার'।

(অর্থাৎ প্রেমই এমন যা সমস্ত দুর্গম অরণ্য অতিক্রম করতে বাধ্য করে। প্রেমই এমন যা শাণিত তরবারীর ন্যায় সম্মুখে মস্তকাবনত করে দেয়)

তাঁর অনুসন্ধান যেহেতু খাঁটী ছিল তাই আল্লাহতা'লা তার খাঁটী মনোবাঞ্ছা বৃথা যেতে দেয় নি এবং তাঁকে স্বয়ং সেই নবীর চরণতলে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি সমস্ত নবীগণের সর্দার (নেতা) ছিলেন। তিনি এখানেও এমন পূর্ণতম দাসত্ব অবলম্বন করেছিলেন, দাসত্বের ধাপ থেকে উন্নতি করতে করতে রসুলুল্লাহর 'আহ্‌লে বায়েত' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সত্য কথা- এই ভালোবাসা তো ভাগ্যবানরা পেতে পারে এবং অবশ্যই হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) একজন সৌভাগ্যবান সত্ত্বা ছিলেন।

সমাপ্ত